ডিসেম্বর ১৯৮০

৪১



# বাংলাদেশে গণশিক্ষা অভিযান

**অধ্যাপক আবদুল বাতেন**

অধ্যাপক আবদুল বাতেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জনসম্পদের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। আর এ জনসম্পদের উন্নয়ন শিক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় উপযুক্ত গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে দেশের বিপুল জনসম্পদের উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, জনগণ শিক্ষিত হলে তারা :

(ক) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিক ফলপ্রসূভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়,

(খ) উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি যথাযথভাবে গ্রহণ করে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে,

(গ) উন্নত আর্থ-সামাজিক তৎপরতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে, এবং সর্বোপরি (ঘ) একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী সুনাগরিকত্ব অর্জন করে। মূলত এ মৌল ধারণার ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের গণশিক্ষা কর্মসূচী তথা অভিযানের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছে।

১৯৭৪ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ২২.২% এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা সাক্ষরদের সংখ্যা যথাক্রমে ২১.১% ও ১০.৭%। নিঃসন্দেহে এটা দেশের সাক্ষরতার একটি করুণ চিত্র। ১৯৭৪ সন থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশের মোট নিরক্ষরদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রক্ষেপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :

| সন | নিরক্ষরদের সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে) | |
|---|---|---|
| ১৯৭৪ | ৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব | ১০ থেকে ৪৫ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে |
| ১৯৭৫ | ৪০২.৯০ | ৩৪২.২৪ |
| ১৯৭৬ | ৪১৪.৭৫ | ৩৫০.২৮ |
| ১৯৭৭ | ৪২৬.৮০ | ৩৫৫.০৭ |
| ১৯৭৮ | ৪৩৯.২০ | ৩৬৬.১২ |
| ১৯৭৯ | ৪৫১.৮৩ | ৩৭৫.০৪ |
| ১৯৮০ | ৪৬৪.৮৬ | ৩৮৪.৩৩ |

এ পরিসংখ্যান থেকে সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আমাদের কর্মক্ষম জনগণের (১০ থেকে ৪৫ বছরের বয়ঃসীমার মধ্যে) মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা জাতীয় উন্নয়নের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। কারণ, দেশের বিরাট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে কিংবা অব্যবহিত পরে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও এ সম্পর্কে উদ্যোগে সাফল্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। একমাত্র সরকারী উদ্যোগে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীকে কেন্দ্র করে জনশিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে দেশের ৭টি থানায় একটি পরীক্ষামূলক (পাইলট) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে এ সকল পাইলট থানাগুলিতে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়।

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার নিরক্ষরতাকে দেশের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দেশকে স্বল্পসময়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সরকারের ১৯ দফা কর্মসূচীর অন্যতম। ১৯৭৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 'নিরক্ষরতা দূরীকরণকে' দেশের বর্তমান শান্তিপূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ১৯৮০ সনের মহান শহীদ দিবসে (২১শে ফেব্রুয়ারী) সারা দেশব্যাপী এক বিরাট গণশিক্ষা অভিযান উদ্বোধন করেন।

মহামান্য প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে গণশিক্ষার কাজ শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি জরুরী গণশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়ে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে :

(ক) উপযুক্ত শিক্ষক নির্দেশিকাসহ চার রকমের সাক্ষরতা পুস্তিকা নির্বাচন এবং এক কোটি পুস্তিকা, ৪ লাখ শিক্ষক নির্দেশিকা, ৪ লাখ নব্য সাক্ষরদের জন্যে ফলোআপ পুস্তিকা এবং ১ লাখ সাক্ষরতা পোস্টার মুদ্রণ :

(খ) মহকুমা শিক্ষা অফিসার, থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে সারাদেশের গ্রামে গ্রামে গঠিত সাক্ষরতা স্কোয়াডের সদস্যগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০ লাখ সাক্ষরতা পুস্তিকা বিতরণ ;

(গ) সকল স্তরের শিক্ষা কর্মকর্তাদের ও সাক্ষরতা কর্মীদের বিভিন্ন পর্যায়ে গণশিক্ষাদান প্রশিক্ষণদান ;

(ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের কারিকুলামের অংশ হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে গণশিক্ষা অভিযানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, (গণশিক্ষার কাজে অংশগ্রহণের জন্যে ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়েছে) ;

(ঙ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগে গণসাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

(চ) সাক্ষরতা কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা।

গণশিক্ষা অভিযানের জরুরী কর্মসূচীর অধীনে জেলা পর্যায়ে প্রতি জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এ সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ মহকুমা অফিসার, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থার সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে সাক্ষরতা স্কোয়াড গঠন (প্রতি গ্রামে অন্ততপক্ষে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পুরুষ ও একটি মহিলা স্কোয়াড) জনগণকে গণশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সক্রিয় গণশিক্ষা অভিযান পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছেন।

জরুরী গণশিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে ১৫০ জন করে সমগ্র দেশের এক কোটি লোককে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রদান করা. এ ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে জনগণ শুধু লিখতে ও পড়তে জানলেই চলবে না। তাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করে সাধারণ চিঠিপত্র লেখা, পারিবারিক হিসাবপত্র রাখা, কিছুটা খবরের কাগজ পড়া ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত সহজ ভাষায় লেখা সরকারী প্রচারপত্র পুস্তিকা পড়ে ও বুঝে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফলপ্রসূভাবে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

গণশিক্ষা অভিযানে বর্তমানে [illegible] ভিত্তিতে যাঁরা গ্রামে গ্রামে সাক্ষরতা শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা হলেন, শিক্ষক, ছাত্র, মসজিদের ইমাম, বেকার শিক্ষিত যুবক, অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য ও কিছু কিছু সমাজসেবী কর্মী। সাক্ষরতা স্কোয়াডের সদস্যগণ স্থানীয় সাহায্য ও সহযোগিতায় সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালনা ও আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষরতার কাজ করে থাকেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাক্ষরতা বইগুলি অবশ্য বিনামূল্যে সাক্ষরতা কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে কাজের নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করণীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ গণশিক্ষা সেল' আছে। এছাড়া বিভিন্ন কাজে 'গণশিক্ষা সেল'কে সহায়তাদানের জন্যে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সাংগঠনিক গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছেন। সার্বিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কাজের উন্নত বিধানের জন্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি গণশিক্ষা টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। এ টাস্ক ফোর্স বর্তমানে সাক্ষরতা কাজে ব্যবহৃত পুস্তিকা ও শিক্ষকদের মূল্যায়ন ও এর আলোকে নতুন উপকরণ উদ্ভাবন প্রসঙ্গে কাজ করছেন।

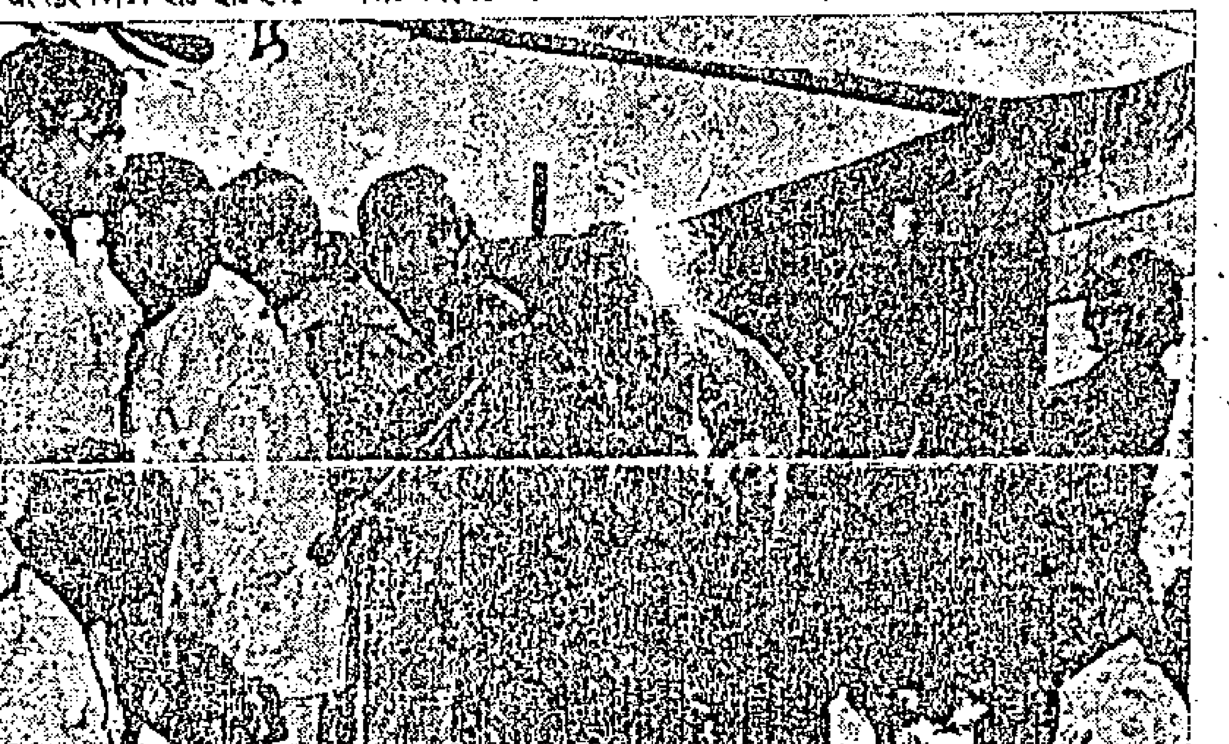

ফরিদপুরে গণশিক্ষা অভিযান উদ্বোধন করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

সরকারের গণশিক্ষা অভিযানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এ প্রসঙ্গে সরকারী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। স্বয়ং মহামান্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে জনগণকে গণশিক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করছেন। সরকারের সকল মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও সংসদ সদস্যগণকে দেশের নির্দিষ্ট এলাকায় পরিকল্পিতভাবে গণশিক্ষা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন এলাকায় গণশিক্ষার কাজ পরিদর্শন ও সাহায্য সহযোগিতাদানের জরুরী নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে নিজ নিজ এলাকায় গণশিক্ষা অভিযানে কার্যকরী অবদান রাখার বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন গণশিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সাক্ষরতার কাজে লিপ্ত বিভিন্ন সমাজসেবী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করছেন।

জাতীয় গণশিক্ষা অভিযানের প্রথম পর্যায় আগামী ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হবে। বিগত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এ পর্যন্ত (অর্থাৎ নবেম্বর, ১৯৮০) প্রায় নয় মাসের কিছু বেশি সময় জরুরী কর্মসূচীর অধীনে কাজের যে অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। প্রথমদিকে কাজের গতি কিছুটা মন্থর হলেও বর্তমানে দেশের গণশিক্ষা অভিযানে বেশ গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশে ১,৪৬,২০১টি সাক্ষরতা স্কোয়াডের অধীনে ৬,৩১,৭১১ জন সাক্ষরতা শিক্ষক কাজ করে যাচ্ছেন। ৩৪৫টি থানা হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৫৭,১২,০৪৮ জন শিক্ষার্থী গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় এসেছেন। দেশের সকল থানার হিসাবে এ সংখ্যা আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এক কোটিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।

গণশিক্ষা অভিযানের প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নের আলোকে আগামী ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী গণশিক্ষা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। এ পর্যায়ে সম্পূর্ণ দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কয়েকটি নতুন স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক) গণশিক্ষা অভিযানের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পৃথক পরিদপ্তর গঠন।

(খ) দেশের সকল জেলা, থানা পর্যায়ে উপযুক্ত গণশিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ।

(গ) দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন স্থায়ী শিক্ষক সংগঠক নিয়োগ।

(ঘ) গ্রাম সরকারসমূহকে গণশিক্ষা সংগঠনের ব্যাপক দায়িত্ব প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

(ঙ) গণশিক্ষা কর্মীদের ব্যাপক কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

(চ) অধিকসংখ্যক উপযুক্ত সাক্ষরতা পুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, ফলো-আপ পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা।

(ছ) উপযুক্ত সাক্ষরতা শিক্ষক ও সংগঠকদের পুরস্কারের ব্যবস্থাও;

(জ) গণশিক্ষা কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন ও গবেষণার জন্যে পর্যাপ্ত কার্যকরী ব্যবস্থা।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিরক্ষরতা যে আমাদের জন্যে একটি অভিশাপ, এ সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না। নিরক্ষরতা আমাদের অবশ্য নির্মূল করতে হবে এবং তা অতি অল্প সময়েই। এটা সম্ভব হবে যদি সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গণশিক্ষা অভিযানকে গণশিক্ষা আন্দোলনে পরিণত করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখব নিরক্ষরতা দূর করতে উন্নয়নশীল অনেক দেশের ২০ থেকে ৩০ বছরের উর্ধ্বে সময় নিয়েছে। কিন্তু আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে এত সময় নেবার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি করে সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারাই আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জাতির বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপকে আমাদের উপড়ে ফেলতে হবেই। জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত ত্বরান্বিত করার জন্যে এর অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা অন্তত আমাদের হাতে আর খোলা নেই।

ডিসেম্বর ১৯৮০

৪১

প্রথম বার্ষিকী। দৈনিক দেশ ২

বাংলাদেশে গণশিক্ষা অভিযান

অধ্যাপক আবদুল বাতেন

অধ্যাপক আবদুল বাতেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

জনসম্পদের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। আর এ জনসম্পদের উন্নয়ন শিক্ষার মাধ্যমেই নিশ্চিত করা সম্ভব। বাংলাদেশের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় উপযুক্ত গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে দেশের বিপুল জনসম্পদের উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, জনগণ শিক্ষিত হলে তারা :

(ক) জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অধিক ফলপ্রসূভাবে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়,

(খ) উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রযুক্তি যথাযথভাবে গ্রহণ করে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারে,

(গ) উন্নত আর্থ-সামাজিক তৎপরতার মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে, এবং সর্বোপরি (ঘ) একটি গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপযোগী সুনাগরিকত্ব অর্জন করে। মূলত এ মৌল ধারণার ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের গণশিক্ষা কর্মসূচী তথা অভিযানের মূল ভিত্তি রচিত হয়েছে।

১৯৭৪ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী আমাদের দেশের সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ২২.২% এর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা সাক্ষরদের সংখ্যা যথাক্রমে ২১.১% ও ১০.৭%। নিঃসন্দেহে এটা দেশের সাক্ষরতার একটি করুণ চিত্র। ১৯৭৪ সন থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশের মোট নিরক্ষরদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রক্ষেপিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের দেশের নিরক্ষরদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নরূপ :

| সন | নিরক্ষরদের সংখ্যা (লক্ষ হিসাবে) | |
|---|---|---|
| ১৯৭৪ | ৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব | ১০ থেকে ৪৫ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে |
| ১৯৭৫ | ৪০২.৯০ | ৩৪২.২৪ |
| ১৯৭৬ | ৪১৪.৭৫ | ৩৫০.২৮ |
| ১৯৭৭ | ৪২৬.৮০ | ৩৫৫.০৭ |
| ১৯৭৮ | ৪৩৯.২০ | ৩৬৬.১২ |
| ১৯৭৯ | ৪৫১.৮৩ | ৩৭৫.০৪ |
| ১৯৮০ | ৪৬৪.৮৬ | ৩৮৪.৩৩ |

এ পরিসংখ্যান থেকে সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আমাদের কর্মক্ষম জনগণের (১০ থেকে ৪৫ বছরের বয়ঃসীমার মধ্যে) মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা জাতীয় উন্নয়নের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। কারণ, দেশের বিরাট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে কিংবা অব্যবহিত পরে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকলেও এ সম্পর্কে উদ্যোগে সাফল্যের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সীমিত। একমাত্র সরকারী উদ্যোগে কুমিল্লার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীকে কেন্দ্র করে জনশিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে দেশের ৭টি থানায় একটি পরীক্ষামূলক (পাইলট) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে এ সকল পাইলট থানাগুলিতে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ থেকে ২৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়।

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার নিরক্ষরতাকে দেশের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। দেশকে স্বল্পসময়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সরকারের ১৯ দফা কর্মসূচীর অন্যতম। ১৯৭৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে মহামান্য প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 'নিরক্ষরতা দূরীকরণকে' দেশের বর্তমান শান্তিপূর্ণ জাতীয় উন্নয়ন বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি ১৯৮০ সনের মহান শহীদ দিবসে (২১শে ফেব্রুয়ারী) সারা দেশব্যাপী এক বিরাট গণশিক্ষা অভিযান উদ্বোধন করেন।

মহামান্য প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে গণশিক্ষার কাজ শুরু হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি জরুরী গণশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং এর মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়ে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে :

(ক) উপযুক্ত শিক্ষক নির্দেশিকাসহ চার রকমের সাক্ষরতা পুস্তিকা নির্বাচন এবং এক কোটি পুস্তিকা, ৪ লাখ শিক্ষক নির্দেশিকা, ৪ লাখ নব্য সাক্ষরদের জন্যে ফলোআপ পুস্তিকা এবং ১ লাখ সাক্ষরতা পোস্টার মুদ্রণ :

(খ) মহকুমা শিক্ষা অফিসার, থানা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে সারাদেশের গ্রামে গ্রামে গঠিত সাক্ষরতা স্কোয়াডের সদস্যগণের মধ্যে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০ লাখ সাক্ষরতা পুস্তিকা বিতরণ ;

(গ) সকল স্তরের শিক্ষা কর্মকর্তাদের ও সাক্ষরতা কর্মীদের বিভিন্ন পর্যায়ে গণশিক্ষাদান প্রশিক্ষণদান ;

(ঘ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের কারিকুলামের অংশ হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে গণশিক্ষা অভিযানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, (গণশিক্ষার কাজে অংশগ্রহণের জন্যে ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট করা হয়েছে) ;

(ঙ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্যোগে গণসাক্ষরতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

(চ) সাক্ষরতা কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং মূল্যায়ন প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করা।

গণশিক্ষা অভিযানের জরুরী কর্মসূচীর অধীনে জেলা পর্যায়ে প্রতি জেলায় একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এ সকল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ মহকুমা অফিসার, সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), স্থানীয় সংস্থার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থার সহযোগিতায় গ্রামে গ্রামে সাক্ষরতা স্কোয়াড গঠন (প্রতি গ্রামে অন্ততপক্ষে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পুরুষ ও একটি মহিলা স্কোয়াড) জনগণকে গণশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সক্রিয় গণশিক্ষা অভিযান পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছেন।

জরুরী গণশিক্ষা কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে ১৫০ জন করে সমগ্র দেশের এক কোটি লোককে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রদান করা. এ ব্যবহারিক সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে জনগণ শুধু লিখতে ও পড়তে জানলেই চলবে না। তাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করে সাধারণ চিঠিপত্র লেখা, পারিবারিক হিসাবপত্র রাখা, কিছুটা খবরের কাগজ পড়া ও গ্রামীণ উন্নয়ন সংক্রান্ত সহজ ভাষায় লেখা সরকারী প্রচারপত্র পুস্তিকা পড়ে ও বুঝে নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ফলপ্রসূভাবে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

গণশিক্ষা অভিযানে বর্তমানে [illegible] ভিত্তিতে যাঁরা গ্রামে গ্রামে সাক্ষরতা শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা হলেন, শিক্ষক, ছাত্র, মসজিদের ইমাম, বেকার শিক্ষিত যুবক, অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী, গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের সদস্য ও কিছু কিছু সমাজসেবী কর্মী। সাক্ষরতা স্কোয়াডের সদস্যগণ স্থানীয় সাহায্য ও সহযোগিতায় সাক্ষরতা কেন্দ্র পরিচালনা ও আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষরতার কাজ করে থাকেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সাক্ষরতা বইগুলি অবশ্য বিনামূল্যে সাক্ষরতা কর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গণশিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে কাজের নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করণীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ গণশিক্ষা সেল' আছে। এছাড়া বিভিন্ন কাজে 'গণশিক্ষা সেল'কে সহায়তাদানের জন্যে মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সাংগঠনিক গ্রুপ কাজ করে যাচ্ছেন। সার্বিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কাজের উন্নত বিধানের জন্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি গণশিক্ষা টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে। এ টাস্ক ফোর্স বর্তমানে সাক্ষরতা কাজে ব্যবহৃত পুস্তিকা ও শিক্ষকদের মূল্যায়ন ও এর আলোকে নতুন উপকরণ উদ্ভাবন প্রসঙ্গে কাজ করছেন।

ফরিদপুরে গণশিক্ষা অভিযান উদ্বোধন করছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

সরকারের গণশিক্ষা অভিযানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এ প্রসঙ্গে সরকারী ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। স্বয়ং মহামান্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ হিসাবে জনগণকে গণশিক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সক্রিয় নেতৃত্ব প্রদান করছেন। সরকারের সকল মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও সংসদ সদস্যগণকে দেশের নির্দিষ্ট এলাকায় পরিকল্পিতভাবে গণশিক্ষা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বাধ্যতামূলকভাবে বিভিন্ন এলাকায় গণশিক্ষার কাজ পরিদর্শন ও সাহায্য সহযোগিতাদানের জরুরী নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে নিজ নিজ এলাকায় গণশিক্ষা অভিযানে কার্যকরী অবদান রাখার বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যে বিভিন্ন গণশিক্ষা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সাক্ষরতার কাজে লিপ্ত বিভিন্ন সমাজসেবী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাসম্ভব সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করছেন।

জাতীয় গণশিক্ষা অভিযানের প্রথম পর্যায় আগামী ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হবে। বিগত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এ পর্যন্ত (অর্থাৎ নবেম্বর, ১৯৮০) প্রায় নয় মাসের কিছু বেশি সময় জরুরী কর্মসূচীর অধীনে কাজের যে অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। প্রথমদিকে কাজের গতি কিছুটা মন্থর হলেও বর্তমানে দেশের গণশিক্ষা অভিযানে বেশ গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশে ১,৪৬,২০১টি সাক্ষরতা স্কোয়াডের অধীনে ৬,৩১,৭১১ জন সাক্ষরতা শিক্ষক কাজ করে যাচ্ছেন। ৩৪৫টি থানা হতে প্রাপ্ত সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত ৫৭,১২,০৪৮ জন শিক্ষার্থী গণশিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় এসেছেন। দেশের সকল থানার হিসাবে এ সংখ্যা আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এক কোটিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।

গণশিক্ষা অভিযানের প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নের আলোকে আগামী ১৯৮১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পাঁচ বছর মেয়াদী গণশিক্ষা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। এ পর্যায়ে সম্পূর্ণ দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কয়েকটি নতুন স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

(ক) গণশিক্ষা অভিযানের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি পৃথক পরিদপ্তর গঠন।

(খ) দেশের সকল জেলা, থানা পর্যায়ে উপযুক্ত গণশিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ।

(গ) দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন স্থায়ী শিক্ষক সংগঠক নিয়োগ।

(ঘ) গ্রাম সরকারসমূহকে গণশিক্ষা সংগঠনের ব্যাপক দায়িত্ব প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান।

(ঙ) গণশিক্ষা কর্মীদের ব্যাপক কার্যকর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

(চ) অধিকসংখ্যক উপযুক্ত সাক্ষরতা পুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, ফলো-আপ পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা।

(ছ) উপযুক্ত সাক্ষরতা শিক্ষক ও সংগঠকদের পুরস্কারের ব্যবস্থাও;

(জ) গণশিক্ষা কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন ও গবেষণার জন্যে পর্যাপ্ত কার্যকরী ব্যবস্থা।

পরিশেষে বলা যায় যে, নিরক্ষরতা যে আমাদের জন্যে একটি অভিশাপ, এ সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারে না। নিরক্ষরতা আমাদের অবশ্য নির্মূল করতে হবে এবং তা অতি অল্প সময়েই। এটা সম্ভব হবে যদি সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে গণশিক্ষা অভিযানকে গণশিক্ষা আন্দোলনে পরিণত করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের দিকে তাকালে আমরা দেখব নিরক্ষরতা দূর করতে উন্নয়নশীল অনেক দেশের ২০ থেকে ৩০ বছরের উর্ধ্বে সময় নিয়েছে। কিন্তু আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে এত সময় নেবার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। ব্যাপক গণআন্দোলন সৃষ্টি করে সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারাই আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জাতির বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপকে আমাদের উপড়ে ফেলতে হবেই। জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত ত্বরান্বিত করার জন্যে এর অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা অন্তত আমাদের হাতে আর খোলা নেই।